একটি চারপাই খাটিয়ার আত্মজীবনী

দধীচি

প্রায় ১৩০০ সালের দিকে ইবন বতুতা ভারতে আসেন। বিদেশি পর্যটকের অবাক চোখে ধরা পড়ে আজব সব জিনিস; আর জিনিসের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা মানুষের জীবনের ধূসর অধ্যায়। না, এবার আপনি হয়তো বলবেন মানুষের জীবন রঙিন; তাহলে জীবনের অধ্যায় ধূসর কি করে হয় ? প্রতি বছর বছরের শুরুতে যে নতুন রঙের প্রলেপ পড়ে; বছরের অন্তে তাই মলিন ধূসর। কালের রঙ হচ্ছে ধূসর।

তো ইবন বতুতা যখন এই অর্যাবর্তে পরিভ্রমন করছিলেন; কোন এক হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে উত্তর ভারতের এক নাম না জানা গ্রামে তিনি থমকে দাঁড়ান। নিজের পর্ণ কুটিরের আঙিনায় বসে হতদরিদ্র এক লোক কোন কিছু খুব মনযোগ দিয়ে বুনে চলেছে। বেশভূষা দেখে লোকটিকে কৃষক বলেই প্রতিত হয়। ইবন বতুতা লিখলেন- "বিস্তৃটির চার পা, সেই চার পা কে পরস্পরের সাথে যুক্ত করেছে আরো চারটি মজবুত কিন্তু হালকা কড়ি কাঠ। রেশম বা সুতির কাপড়ের সরল বুননের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এর নমনীয় ও আরমদায়ক পাটাতন"। সেই অশীতিপর বৃদ্ধ বললেন- "মহোদয়; এর নাম চারপাই বা খাটিয়া; আমাদের জন্ম, মৃত্যু, প্রেম সব এই চারপাইয়াতেই"। ভিনদেশী পর্যটক নিজের ভ্রমন বৃত্তান্তে খাটিয়া নিয়ে টীকা লিখলেন বটে কিন্তু নিজের মানস চক্ষে ধূসর হয়ে যাওয়া কোনো পাতায় চারপাই কে দেখতে পেলেন কি না তা আজ আর জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু ইবন বতুতা নন; এই কাহিনী আমাকে শুনান বেহরাইচ জেলার কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামের রামদাস প্রজাপতি। ঘটনা আজ থেকে প্রায় এক দশক আগের; ইবন বতুতা এই দেশ থেকে চলে যাওয়ার সহস্র বছর পর।

সময়ের চৌরাস্তায় আমাদের আবার দেখা হয় সেই অশীতিপর বৃদ্ধের।

প্রভুলাল জাটব সকাল থেকেই আজ খাটিয়া বানানোর কাজে লেগে পড়েছে। বিয়ের আর বেশিদিন বাকি নেই। শত অভাব অনটন থাকলেও মেয়ে গুড়িয়ার বিয়েতে কোন কার্পণ্য করতে রাজি নয় প্রভুলাল। গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে। গ্রামের লোকজনও নিজেদের সামর্থ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যন্ত এ গ্রামে বিদ্যুৎ হচ্ছে বিলাসিতা; দিনের আলো নেভার পর কুপি, লণ্ঠনই ভরসা। পাকা রাস্তাঘাট আছে সরকারি অফিসের নকশায়, রামলালরা যাতায়াত করে জমির আল ধরে। গ্রামে প্রবেশের পথের মোড়ে ঢের হয়ে আছে পুঁতি গন্ধময় আবর্জনার স্তূপ। পাশের গ্রামেই ঠাকুরদের বসতি; আবর্জনা ফেলার জন্য ওরা এই জায়গাটাকেই বেছে নিয়েছে।

প্রভুলাল খাটিয়া বানাচ্ছে সকাল থেকেই। মেয়ের বিয়েতে অনেক লোক আসবে; বর যাত্রীরা আসবে। এতো লোকের বসার ব্যবস্থা তো করতে হবে। চেয়ার টেবিল শহরের লোকেরা ব্যবহার করে; গ্রামের লোকেদের কাজের জিনিস হচ্ছে খাটিয়া। এতে বসা যায়, শুয়ে থাকা যায়, বসে খাবার খাওয়া যায়, সারা সকাল খেতের কাজের পর ভর দুপুরে গাছ তলায় খাটিয়া লাগিয়ে বিশ্রাম করা যায়। প্রভুলালকে বানাতে হবে গোটা সাত আট খাটিয়া। ইচ্ছে করলে কিনেও আনা যেত খাটিয়া কিন্তু প্রভুলালকে ছোট বেলাতেই গাঢ় বুনুনের খাটিয়া কি করে বানাতে হয় তা শিখিয়ে দিয়েছিল তার দাদু। তাই আজ সে নিজেই লেগে পড়েছে। টাকা সাশ্রয়ের কথাটা আর নাই বা বললাম। মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা আর আরো আনুষঙ্গিক খরচ মেটাতে বাজারে অনেক দেনা হয়ে গেছে প্রভুলালের।

বিয়ের দিন সকাল থেকেই প্রভুলালের দম ফেলার ফুরসত নেই। এই বাড়িতে শেষ করে

কোন উৎসব হয়েছিল, তা প্রভুলাল স্মৃতি হাতড়েও খুঁজে পায়নি। খুব স্বল্প পরিসরে হলেও প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের খুশির আবহে জমজমাট হয়ে উঠে বিয়ে বাড়ির পরিবেশ; আনন্দ ঘন পরিবেশে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে।

ইবন বতুতার কি কালভেদী দৃষ্টি ছিল ?

যেমন নৈপুণ্যের সাথে তিনি নিজের সমকালকে বর্ণনা করেছেন ঠিক তেমনি কোন এক মলীন গোধূলি লগ্নে হয়তো বহু কালস্তর ভেদ করে পৌঁছে যেতে পারতেন অধুনা সেই পুতিগন্ধময় গলির মুখে। বাকশক্তি রহিত ইহকালে অদৃশ্য ইবন বতুতা কালের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলাবদ্ধ; নীরব দর্শক মাত্র। কিন্তু কোন আশ্চর্য জাদুবলে তিনি এখনো টীকা লিখতে সক্ষমা !

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই বিদ্যুৎ বিহীন গ্রামের সেই বিয়ে বাড়িতে জ্বলে উঠে কুপিবাতি সহ আলোর সব অন্যান্য ব্যবস্থা; গুহামানবের আগুন আবিষ্কারের পর থেকে তাতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রজাপতি বাবু অবশ্য আমাকে বলেছিলেন- "আগুন দিয়ে গুহা মানব খাবার ঝলসে খেত, আলো জ্বালতো, আর হিংস্র জানোয়ারদের দূরে থাকতো; হিংস্র জানোয়ারের সেই ভয় আজ হয়তো কেটে গেছে"।

বিয়ে বাড়িতে অশ্বারোহী বর ও বরযাত্রীরা পৌঁছায় সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পর। মেয়ের বাড়ির লোকেরা প্রথমে তো কিছুটা ঘাবড়ে যায়; এত এই হুল্লোড় করে এই গ্রামে কোনদিন বর আসেনি, অশ্বারোহী বরও এই গ্রামে আশ্চযর্কর। প্রভুলাল একাধারে ব্যস্ত অপরদিকে আনন্দে অতিভূত। নিজের মেয়ের বিয়ে সে এতো ভালোভাবে হবে, প্রভুলাল কল্পনা করেনি। আনন্দাশ্রু নিমিষে গামছায় মুছে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। অনেক পরিশ্রম করে এতগুলো খাটিয়া বানানোর পড়েও সংখ্যায় কম পড়েছে। অনেক বরযাত্রী এখনো দাঁড়িয়ে আছে নানা জায়গায়।

বিয়ের অনুষ্ঠানের যখন মালাবদল পর্ব চলছে; বরযাত্রীরা তখন বাজি পটকা ফাটানোতে মেতে উঠে। পটকার শব্দ বাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে গলির মুখ অব্ধি।

গ্রামের লোক, বরযাত্রী আর প্রভুলাল যা দেখতে পায়নি; পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার গলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কালভেদী দৃষ্টির অধিকারী অতীতকালের ইবন হয়তো তা দেখতে পেয়েছিলেন; ঠাকুরদের গ্রামের দিক থেকে দুর্বার গতিতে ছুটে আসা তিনখানা জীপ।

গত কয়েক দশকে দলিতদের গ্রামে এমন উল্লাস, এমন কলরব কোনসময় কর্নগোচর হয়নি ঠাকুর শ্যাম সিং এর। একি উল্লাস, দম্ভ নাকি এলাকায় উনাদের প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করার স্পর্ধা ? যে লোকজন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঠাকুর শ্যাম সিং এর পূর্বজদের জমিতে নামমাত্র পারিশ্রমিকে খেটেছে, ছাগল চড়িয়ে দিনানিপাত করেছে, আজ তারা সামান্য রাজনৈতিক পালাবদল হতেই চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, এত সাহস ! ঘোড়ায় চড়ে বর যাওয়া, শৌর্যের প্রতীক; এতে ঠাকুরদের চিরন্তন অধিকার, আজ এই শৌর্য অর্জনের কাঙ্খা বস্তিপাড়ের লোকেদের মনে চেপেছে; এর বিহিত করতেই হবে।

আজ বেরোনোর সময় ঠাকুর শ্যাম সিং হাতে তুলে নিয়েছেন বহুদিন ধরে ব্যবহার না হওয়া পরিবারের শৌর্য্যের প্রতীক ঐতিহ্যবাহী রাইফেল।

আচম্বিতে দ্রুত গতিতে বিয়ের মণ্ডপে পৌঁছয় ঠাকুরদের তিনটি গাড়ি। বিয়ের আনুষ্ঠানিক পর্ব ততক্ষনে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। সবাই কিছু বোঝার আগেই এক সাথে অনেকগুলো গুলির শব্দ। কান ফাটা গুলির শব্দে একঝাঁক পাখি উড়ে পালালো। পরবর্তী কয়েক মিনিটে আমরা দেখতে পাই গুলির শব্দ, আগুনের ঝলক, ইতিউতি আলো আধার লাল রক্ত আর বারুদের এর উৎকট মিশ্রণ;

আর পত্‌পত্‌ করে উড়তে থাকা শৌর্য্যের পতাকা।

প্রভুলালের খাটিয়া খুবই টেকসই। আধঘন্টা মতো পর যখন শ্যাম সিং প্রভুলালের পর্ণকুটির থেকে বেরিয়ে এসে জীপে চেপে বেরিয়ে গেলেন; তখন সেই খাটিয়ার একটিতেই পড়ে ছিল ছাদের দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকানো মুনিয়ার বিবস্ত্র শরীর। আশ্চর্যজনক ভাবে দারিদ্রের ওপর চেপে বসা লালসা, জাত্যাভিমান ও দম্ভের ভার এক সাথে বহন করে নিয়েছে সেই চারপাই খাটিয়া!

আমি পরবর্তী প্রশ্ন করার আগেই কিন্তু প্রজাপতি বাবু আশ্চর্যজনক ভাবে আমার মনে থাকা প্রশ্ন জেনে যান জানিয়ে দিয়েছিলেন বাকি চারপাই খাটিয়াগুলোর কি হয়।

নদীর কিনারায় থাকা শ্মশানে প্রভুলালের মৃতদেহ সৎকার করার উপায় ছিল না; কোন দূর অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তার মৃতদেহ। একটি খাটিয়াই বহন করে বৃদ্ধ প্রভুলালের নগণ্য স্পন্দনহীন শরীর।

দুদিন পর সেই গ্রামে পৌঁছান নিপীড়িত লোকেদের উঠতি নেতা দুশহন। তার ডাকা সভায় ভয়ে হলেও অনেক লোকই যায়। প্রভুলালের বানানো খাটিয়ার বসে দুশহন হুঙ্কার দেয় ঠাকুরদের অত্যাচারের দিন শেষ; বিপ্লব দুয়ারে কড়া নাড়ছে। এবার মারের বদলা হবে পাল্টা মার। সমর্থন দেয় গ্রামের লোকজন। গ্রামের লোকজন নিয়তি দেখতে পায়না। দেখতে পায়না দূর রাজদরবারের নিয়তির নীতিনির্ধারকদের। খাটিয়া নয় উনারা বসেন মখমলে মোড়ানো সিংহাসনে।

আর বাকি খাটিয়া ? সে তো ছড়িয়ে গেছে পুরো গ্রাম্য ভারতে। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে, দেহপসারিনির স্যাঁতসেঁতে ভাঙা দলান কোঠায়, কৃষকের আঙিনায় সব জায়গায় ঠাঁই পেয়েছে চারপাইয়া খাটিয়া।

সেই দিন সন্ধ্যায় পুতিগন্ধময় রাস্তার বাকের পাশে দাঁড়িয়ে ইবন দেখলেন গ্রামে আগুনের শিখা, শুনলেন গুলির শব্দ, মানুষের আর্তনাদ, নাকে এসে লাগলো স্বেদ, অস্থি, চর্ম দহনের উৎকট গন্ধ।

কালক্রমী পর্যটক ইবন বতুতা আজ ভাবলেশহীন। তিনি টীকা লিখলেন- "খাটিয়া বস্তুটির চার পা, সেই চার পা কে পরস্পরের সাথে যুক্ত করেছে আরো চারটি মজবুত কিন্তু হালকা কড়ি কাঠ। রেশম বা সুতির কাপড়ের সরল বুননের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এর নমনীয় ও আরামদায়ক পাটাতন"।

* * *